সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই মূলত কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক সেই সময় তাঁদের রচনায় নিয়ে আসেন মূল জনসমাজের বাইরের শহরতলি, বস্তি, কয়লাখনি অঞ্চল। ফলে আঞ্চলিকতার একটা ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৩৮), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (১৯৪৪), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৫১) থেকে বর্তমানের কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' (২০১৮) পর্যন্ত উপন্যাসগুলিতে মূলত দেখা মেলে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পটভূমি, জনজাতির সংস্কৃতি, প্রকৃতি, লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকাচার, ভাষা-সংলাপ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির বর্ণনা। এর ফলে সভ্যসমাজ এইসব ব্রাত্য, অন্ত্যজ জীবনধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের যে-ধারা প্রবহমান তাতে আঞ্চলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে এর মধ্যেও নানা উপবিভাগ গড়ে উঠেছে। যেমন— সুন্দরবনের সাহিত্য, রাঢ় বাংলার সাহিত্য, উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, পুরুলিয়ার সাহিত্য এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রশাসনিক ও সাহিত্যে 'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি বহুল প্রচলিত। তবে, পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে একমত 'উত্তরবঙ্গ' একসময় 'পৌণ্ড্রদেশ' নামে অভিহিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল— পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), সমতট (পূর্ববঙ্গ), কামলঙ্কা (কুমিল্লা), তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণবঙ্গ) ও কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ)। এ ছাড়া আসাম ও কোচবিহার নিয়ে তৈরি হয়েছিল কামরূপ রাজ্য। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' বা 'পৌণ্ড্রদেশ' যখন বল্লাল সেন দ্বারা বঙ্গদেশে অন্তর্ভুক্ত হল তখন তা 'বরেন্দ্রভূমি' বা 'বারেন্দ্র' নামে পরিচিত হল। এই বরেন্দ্রভূমিই যে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ সেই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, উত্তরবঙ্গ বোঝাতে 'উত্তর' শব্দটি আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত 'রামায়ণ'-এর আত্মকাহিনিতেও পাই।

‘বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার।
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।।’

কৃত্তিবাসের ছাত্রজীবন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ‘বারো বছর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসের উচ্চশিক্ষা শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে পড়ে কৃত্তিবাস সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে তাঁর পাঠ সমাপ্ত হয়। বিদ্যাসাঙ্গের পর গুরুর কাছে অনেক প্রশংসা লাভ করে কৃত্তিবাস বিদায় নেন।’ সে-ই গুরুর কথা আমরা পাই অমিয় সঙ্কর চৌধুরীর ‘কৃত্তিবাস ও বাংলা রামায়ণ’ গ্রন্থের আলোচনায়। অক্ষয় কুমার কয়াল সংগৃহীত কৃত্তিবাস ও জয়দেব ভণিতায় অঙ্গাদ রায়বার-এর পুথিতে পাওয়া যায়—

‘এক দুই তিন চারি দ্বাদশ প্রবেশ।
পড়িবারে কিত্তিবাস গেলেন উত্ত(র) দেশ।।
উত্তরের গুরু বন্দ আচার্য্য দিবাকর।।’

তা ছাড়াও মধ্যযুগের কবি মানিক দত্তের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, জগজ্জীবন ঘোষালের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে উত্তরবঙ্গের চিত্র পাওয়া যায়। মানিক দত্ত মালদহের ফুলফুল্যানগরের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্বজ্জনেরা মনে করেন, এটি আসলে মালদহের ফুলবাড়ি। দেবী যখন কবিকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন তখন কাব্যে মালদহের এই ফুলফুল্যানগর শব্দটি পাওয়া যায়। খুব সাধারণভাবে ধরে নিতে গেলে এই ফুলফুল্যানগরও উত্তরবঙ্গের সীমানার মধ্যে পড়ে।

‘পদ্মা বোল শুন মা সর্ব্বমঙ্গল।
মাণিক দত্ত কানা খোঁড়া ফুলফুল্যানগর।।’

আর জগজ্জীবন ঘোষালের ‘মনসামঙ্গল’ পুথিটি পাওয়া যায় মালদহের ডোমাইচক থেকে। কবির পোষক দিনাজপুরের জমিদার মহারাজ প্রাণনাথ। কবিতার আত্মজীবনী অংশে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি যখন কুচিয়া মোড়া স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন তখন বোঝা যায় তিনি এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন— যা উত্তরবঙ্গেরই দিনাজপুরের অন্তর্গত।

‘জগত জীবন কবি মনসার দাস।

গ্রাম কুচিয়া মোড়া যাহার নিবাস।।'

সাধারণ অর্থে 'উত্তরবঙ্গ' হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দিনাজপুর ও মালদহ জেলা নিয়ে। তবে এটি মৌখিকভাবে 'উত্তরবঙ্গ' ও প্রশাসনিকভাবে 'জলপাইগুড়ি ডিভিশন' নামে পরিচিত। কিছু গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে এই উত্তরবঙ্গের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। যেমন- সুশীল কুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৭০), নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (১৯৭৭), নির্মল দাশের 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ' (১৯৮৪), শিশিরকুমার মজুমদারের 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও লোকজীবন' (১৯৮৪), স্বরজিৎ চক্রবর্তীর 'উত্তরবঙ্গ কিছু স্মৃতি কিছু অন্বেষণ' (২০০১)। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য মূল অভিসন্দর্ভে নেওয়া হয়েছে।

এই উত্তরবঙ্গের বনভূমি, কৃষিভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদী-উপনদী-শাখানদী, চা-বাগিচা, ছোটো-বড়ো গ্রাম-গঞ্জ, শহর, বন্দর জুড়ে রয়েছে বহুবিচিত্র জাতি-জনজাতির জীবনচর্চা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার, সংস্কৃতিচর্চা। কালের স্রোতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। সবই পরিবর্তনশীল। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তবে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতি সর্বদায় কম পরিবর্তনশীল। বাংলা সাহিত্যের আবহমান কালের লেখকেরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, নতুনত্বের খোঁজে তাদের রচনার মধ্যে তুলে ধরেছেন বিষয় ভাবনায় নিজ নিজ জীবনদর্শনের নব-চেতনার আলেখ্য। কেউ-বা জন্মসূত্রে (অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, তিলোত্তমা মজুমদার প্রমুখ) আবার কেউ-বা কর্মসূত্রে (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কেউ-বা ওপার বাংলা থেকে এসে (বিমল ঘোষ) উত্তরবঙ্গের জল, মাটি, মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁদের রচনার মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে-রাজনৈতিক দোলাচলতা তা উভয় দেশের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা বড়ো প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল। কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া

আর পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ জেলা নিয়ে 'রাজশাহী ডিভিশন' তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল একসময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবে এই রাজনৈতিক পালাবদলের সময় দুই দেশের মানুষের স্থানান্তর ঘটে। এই স্থানান্তরের দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদান-প্রদান ঘটে যায়। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যে তার একটা প্রভাব পড়ে। আশা করি, এই গবেষণাকর্মের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক মেলবন্ধন ঘটেছিল তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম 'উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ (১৯৮১-২০০০)। উত্তরবঙ্গের নানান সম্প্রদায়ের লোকজ উপাদানগুলোর বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য আলোচ্য শিরোনামকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মটি বিস্তার লাভ করেছে। পাঁচটি অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : **নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে লোকজ উপাদান**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **উত্তরবঙ্গের লোকজ উপাদানের পরিচয়**

তৃতীয় অধ্যায় : **প্রথম পর্ব – নির্বাচিত উপন্যাসে লোকজ উপাদান (১৯৮১-১৯৯০)**

চতুর্থ অধ্যায় : **দ্বিতীয় পর্ব – নির্বাচিত উপন্যাসে লোকজ উপাদান (১৯৯১-২০০০)**

পঞ্চম অধ্যায় : **তুলনামূলক আলোচনায় উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসের লোকজ উপাদানের বিশেষত্ব**

প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে নির্বাচিত উপন্যাস ও নানান জনগোষ্ঠীর লোকজ উপাদানকে নানা প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের নানান জনজাতির নানা ভাষাগোষ্ঠীর লোকজ উপাদান যেমন এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি মিশ্র সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে লোকজ উপাদান সম্পর্কে আলোচনার জন্য লোকজ উপাদান কি তা আগে স্পষ্ট করা হয়েছে। ইংরেজি 'Folklore'-এর সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ ধরা হয় 'লোকসংস্কৃতি'। তবে 'Folk' এর প্রতিশব্দ 'লোক' শব্দটি গৃহীত হলেও 'lore' এর প্রতিশব্দ রূপে দেখা দিয়েছে— কলা, কৃষ্টি, যান, চর্যা, বার্তা, ঐতিহ্য প্রভৃতি। আর লোকজ

উপাদান বলতে আমরা এই লোকসংস্কৃতিকেই বুঝব। অর্থাৎ লোকজ উপাদান হল লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই লোকজ উপাদানকে বুঝতে লোকসংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা করা হয়েছে। যথা— ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি এবং খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি।

ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Material Folklore) : লোকজ জীবনে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত বস্তুসমূহকেই এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে যে বিষয় বিরাজমান তা হল— লোকযান, লোকঅস্ত্র, লোকযন্ত্র, লোকশিল্প, লোকপোশাক-পরিচ্ছদ, লোকপ্রযুক্তি, লোকখাদ্য, লোকঔষধ, লোকনেশা, লোকতৈজস ইত্যাদি।

খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Formalised Folklore) : এই লোকজ উপাদানটি মূলত লোকায়ত সমাজজীবনে মনের ভাব বিনিময়, আনন্দ-বেদনা, বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের মনের মধ্যে নানান বিশ্বাস সংস্কার সত্য মিথ্যার বেড়াজালে বন্দি। যেমন— আমরা সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকি। লোকসংস্কৃতির এই লোকজ উপাদানটি টোটেম ট্যাবু নামে পরিচিত। এই পর্যায়ের উপাদানগুলি হল— লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকছড়া, লোকপ্রবাদ, লোককথা, লোকগালিগালাজ ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসের লোকজ উপাদানগুলোকে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি পর্বে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা হল—

১. বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকের উপন্যাস ও লোকজ উপাদান

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫), ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬), ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩), ‘দেবী চৌধুরানী’ (১৮৮৬) প্রভৃতি।

খ. রমেশচন্দ্র দত্ত— ‘সংসার’ (১৮৮৬) এবং ‘সমাজ’ (১৮৯৪)।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে লোকজ উপাদান

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭) 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)।

খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— 'নব-বিধান' (১৩৩১), 'পথের দাবী' (১৩৩৩), 'শেষ প্রশ্ন' (১৩৩৮), 'শুভদা' (১৯৩৮)।

৩. ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোকজ উপাদান

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'পথের পাঁচালী (১৯২৯), এবং 'ইছামতী (১৯৫০)।

খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়— 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭)।

গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'উত্তরবঙ্গের লোকজ উপাদানের পরিচয়'। তবে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি জানার আগে এই বঙ্গের ভূপ্রকৃতি ও জনজাতির কথা জানা অনেক প্রয়োজন। গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার— এই চারটি জেলাকে প্রান্তীয় 'উত্তরবঙ্গ' এবং উত্তর-দক্ষিণ দুই দিনাজপুর ও মালদহ জেলাকে 'গৌড়বঙ্গ' বলা হয়। এই ভূপ্রকৃতির যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি জনবিন্যাসের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস থেকে বোঝা যায় ভারতে যে-চারটি ভাষাগোষ্ঠী (ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়) প্রচলিত তার সবগুলিই এখানে বিদ্যমান। তবে বিভিন্ন বাচকগোষ্ঠীর জনসংখ্যায় তারতম্য রয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম থেকে শুরু করে রাজবংশী, রাভা, গারো, বোড়ো-মেচ, ধিমাল, টোটো, তামাং, লিম্বু, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতির কথা না-বললেই নয়। এই বিচিত্র জনজাতিদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির উপাদান থাকা সত্ত্বেও এদের সকলের মধ্যে এক প্রকার ঐক্যসূত্র গড়ে উঠেছে।

এই অধ্যায়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের নানান ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজ উপাদানগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এখানে যেসব জনগোষ্ঠীর লোকজ উপাদান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হল— রাজবংশী, বোড়ো-মেচ, রাভা, ধীমাল, আদিবাসী ওঁরাও, তামাং প্রভৃতি।

যেসব লোকজ উপাদান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হল— লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককথা, পূজাপার্বণ, বাদ্যযন্ত্র, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি।

তৃতীয় অধ্যায় : প্রথম পর্ব— নির্বাচিত উপন্যাসে লোকজ উপাদান (১৯৮১-১৯৯০)। এই অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত চারটি উপন্যাস নির্বাচন করা হয়েছে। সেগুলো হল অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'বিনদনি' (১৯৮৫), 'হলং মানসাই উপকথা' (১৯৮৬) এবং দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮)। এই উপন্যাসগুলোতে রয়েছে মূলত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, রাভা, বোড়ো-মেচ, ওঁরাও, তামাং, লিম্বু প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ সংস্কৃতির ভাষা, ধর্ম, খাদ্যপ্রণালি, জীবনচর্চা। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে আগত নমশূদ্রদের সঙ্গে এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মিলনদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আবার এই উপন্যাসগুলোতে লক্ষ করা যায় ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের নানা পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সাধারণত হয়েছে উত্তরবঙ্গের নানান জনজাতির মধ্যে। যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। যেমন রাভা জনজাতির ভাষা ও ধর্মের পরিবর্তন ঔপন্যাসিক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। আবার রাজবংশীদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে পরিবর্তন তা দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে নির্বাচিত উপন্যাসের মধ্যে থাকা লোকজ উপাদানের বিভিন্ন দিক।

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পর্ব— নির্বাচিত উপন্যাসে লোকজ উপাদান (১৯৯১-২০০০)। এই অধ্যায়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে যা চারটি উপন্যাস নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলো হল— অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মাকচক হরিণ' (১৯৯১), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপুরাণ' (১৯৯৭), তিলোত্তমা মজুমদারের 'মানুষশাবকের কথা' (১৯৯৮) এবং বিপুল দাসের 'লাল বল' (২০০০)। এই উপন্যাসগুলোতে রয়েছে উত্তরবঙ্গের নানা জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম এবং প্রকৃতির চিত্র। এই বর্ণনায় উঠে এসেছে রাভা ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা ও ধর্ম এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন।

পঞ্চম অধ্যায় : তুলনামূলক আলোচনায় উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসের লোকজ উপাদানের বিশেষত্ব। এই অধ্যায়কে দুইটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত ১৯৮১-২০০০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচিত উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের প্রথাগত, লোকজ উপাদানের ধারার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নির্বাচিত উপন্যাসিকের উপন্যাসের লোকজ উপাদানের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য উপন্যাসিকের উপন্যাসের লোকজ উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত অন্যান্য ঔপন্যাসিক হল— সমরেশ মজুমদার, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (চোমং লামা), বিমল লামা, নিয়তি রায়, অভিজিৎ সেন, অমল কৃষ্ণ রায় প্রমুখ। এই অধ্যায়ের মধ্যে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের নানা জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং তাদের মধ্যে মিলনদৃশ্য।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মধ্যে উত্তরবঙ্গের নানান জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নানা জনগোষ্ঠীর লোকজ উপাদানগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাদের লোকজ উপাদানগুলো যা যা রয়েছে তা বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ভূমিকা ও উপসংহার বাদেও এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মধ্যে পরিশিষ্ট অংশ রাখা হয়েছে। যেখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত চিত্রাবলী স্থান পেয়েছে এবং সেই চিত্রাবলী উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নির্বাচিত উপন্যাসগুলোতে রয়েছে। তাছাড়া এই চিত্রগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গের নানান জনগোষ্ঠীর লোকজ উপাদান। এরপরে ‘গ্রন্থপঞ্জি’ ও ‘নির্ঘণ্ট’ সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটি সমাপন করা হয়েছে।